তারিখ ... 21 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

সবাই যা দেখে

লেখাপড়ার সঙ্গে স্নেহও বড় প্রয়োজন

আব্দুল মান্নান খান

শিশুদের লেখাপড়া নিয়েই সাধারণত আমি কিছু বলার চেষ্টা করে থাকি এ কলামে। আজও করব তবে তার আগে ওরা কেমন থাকছে আদর-সোহাগ কতটুকু পাচ্ছে এবং অভিভাবকরাইবা সেটা কতটুকু দিতে পারছেন সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। বলতে চাই শিশুদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে গেলেই সব হয়ে যায় না, ওদের প্রাণভরে আদরও করতে হয়– একেবারে জড়িয়ে ধরে আদর করা যাকে বলে। বলবেন, এ কেমন কথা, শিশুদের আবার আদর করে না কে! আর আদর-যত্ন ছাড়া দায়িত্ব পালন হবেই বা কীভাবে। হয়। কারণ দায়িত্ব পালন এক জিনিস আর আদর-স্নেহ দিয়ে লালনপালন করে গড়ে তোলা আরেক জিনিস। একটা ছোট্ট ঘটনা বলি, ভদ্রমহিলার স্বামী আমেরিকায় লেখাপড়া করতে গেলেন। তিনিও গেলেন সাথে। আমেরিকায় আমাদের দেশের মতো এত কাজের লোকজন পাওয়া যায় না। কাজেই সেখানে জন্ম নেয়া তার ছেলেটির লালন-পালনের সব কাজ তাকেই করতে হয়। ঘড়ি ধরে সময়মতো খাওয়ানো ঘুম পাড়ানো সবই। তার জন্য নানা রকম খেলনা সামগ্রী তো আছেই আর আছে টেলিভিশন। টেলিভিশনে কার্টুন ছবির চ্যানেল ধরাই থাকে। ছোট্ট শিশু তার থেকে চোখ ফেরায় না কেবল চেয়ে থাকে। এভাবেই যেতে থাকে সময়। এদিকে ছেলের বয়স তিন বছর পার হয়ে চারে পড়ে কিন্তু সে কোন কথা বলে না। কান-গলা সব পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন কোন সমস্যা নেই। সমস্যা নেই অথচ কথা বলছে না, বাবা-মা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। আরো যে সময়টা সেখানে থাকা যেত তা না থেকে দেশে ফিরে এলেন।

দেশের ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থেকে অল্প দিনেই শিশুটির কথা ফুটতে শুরু করল। ডাক্তারের দাওয়াই ছিল– যত বেশি সময় সম্ভব শিশুটির সঙ্গে কথা বলতে হবে। ঘটনা হলো, বাবার কথা না হয় বাদই দিলাম মা-ই তেমন কোন কথা বলেননি বা বলতে পারেননি ছেলের সাথে। দায়িত্ব পালন করেছেন ঠিকই কিন্তু আদর-সোহাগ করে মুখে বলেননি– আমার বাবা কই, আমার খোকন সোনা কই। দুহাতে তালি দিতে দিতে বলেননি, তাই তাই তাই, মামাবাড়ি যাই'। শিশুটির সাথে উঠতে বসতে এ রকম 'আগডুম বাগডুম' যা-ই হোক করলে সে কথা বলা শিখে যেত। দেশের ডাক্তার এসব কথাই বললেন ভদ্রমহিলাকে। অতএব যত যায-ই বলা হোক না কেন, শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে কথা বলার, ছড়া-কবিতা গান শোনানোর কোন বিকল্প নেই অন্তত আমাদের এ বাঙালি মানসে। বাঙালি মন নরম সে তো ওই মা আর মাটির কারণে। কিন্তু নানা কারণে এখন এর ছেদ পড়তে শুরু করেছে। অনেক মা-ই আর এখন সেরকম আচরণ করতে পারছেন না শিশুর সাথে। সময়ও দিতে পারছেন না। অনেক মায়েরা মনে করছেন এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই। বরং শিশুকে শুরুতেই বুঝতে দেয়া ভালো, মাকে সব সময় কাছে পাওয়া যাবে না।

সব সময় কাছে পাওয়া যাবে না– একথা ঠিক আছে। কিন্তু যখন কাছে পাওয়া যাবে, এখানে কথা সে সময়টুকু নিয়ে। সারাক্ষণ শিশুদের সামনে টিভি চালিয়ে রাখার কালচারে আমরাও পৌঁছে গেছি। এক টিভিতে এখন আর কোন পরিবারের চলছে না। কম্পিউটারের সাথে ইন্টারনেট ছাড়াও চলছে না। মোবাইলে তো আছেই জনে- জনে+ আমাদের- দুধের শিশুরাও ওই কার্টুন ছবির শব্দ আর দ্রুত গতির আলোর খেলা থেকে চোখ ফেরাচ্ছে না। তারপর একটু হাঁটাচলা কথা বলা শিখল তো অন্য কিছু শেখার আগে কার্টুন ছবির চরিত্রগুলোর নাম-চেহারা শিখে যাচ্ছে সহজে। তিন বছর বয়সের একটা শিশুর কাছে টম-জেরি তো কোন ব্যাপারই না– টয় স্টোরির চরিত্রগুলোর নামসহ আরও কত নাম সহজে সে বলে যাচ্ছে । টয় স্টোরির উডি বাজ শুধু না মিস্টার বিন, চার্লি চ্যাপলিন, স্কুবিডু, পিঙ্গু, স্পাইডার ম্যান, ব্যাটম্যান, আইরনম্যান এমন আরো কত কিছুর নাম ধরে সে দেখতে চায়। এসব নামের খেলনা বাজারে জমজমাট জমে উঠেছে সেগুলো কিনতে চায়, টিভি তো আছেই তার সাথে অভিভাবকরাও অনেকে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে বা সিডি কিনে সেগুলো দেখার ব্যবস্থা করে দেন। দেখতে না দিলে খাওয়ানো দায় হয়ে যায়। এখানেই মায়েদের হয়েছে সুবিধা। শিশুকে খাওয়াতে কত আদর দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে নানা কিছু দেখিয়ে নানা কথা বলে ছড়া-কবিতা গল্প শুনিয়ে খাওয়ানোর প্রয়োজন হচ্ছে না। কেউ একজন মুখে দিচ্ছে আর টিভিতে চোখ রেখে শিশু খেয়ে যাচ্ছে। মা খাওয়াচ্ছে না কে খাওয়াচ্ছে সেদিকেও কোন ভ্রুক্ষেপ থাকছে না।

বলছি কর্মজীবী মায়েদের কথা। শিশু অপেক্ষায় থাকে কখন মা তাকে কাছে টেনে নেবে। কিন্তু সারাদিন কর্মব্যস্ত মা বাসায় ফিরে যদি কেবল খবরদারিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তখন ঘটে বিপত্তি। বেবিকে ঠিক মতো খাওয়ানো হয়েছে কিনা, ঘুমিয়েছে কিনা অথবা স্কুল পড়ুয়াদের প্রতি শুরু করেন – কোচিং-এর খাতাগুলো বার করো, ক্লাসের খাতা বার করো, ক্লাস টিচার কী লিখেছেন দেখাও তখন দুধের শিশু না হয় ঘুমিয়ে গেল বড় শিশুরাও আদর চাওয়া তো দূরের কথা, চাইবে না মা কাছে আসুক। এভাবে মা দেখছেন তার সন্তান বা সন্তানেরা লেখাপড়া করছে খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমাচ্ছে এই তো সব ঠিক আছে। কিন্তু আসলে কি সব ঠিক আছে? শিশুরা মায়ের আদর চায়। পরিবারের সকলের স্নেহ-ভালোবাসা চায়। কিন্তু অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে মায়েরাও নিরুপায়। ঘরে-বাইরে সব মিলিয়ে ব্যস্ত জীবন পার করছেন তারা। কী করতে পারেন একজন মা। সন্তানদের একটু সুখ-শান্তিতে রাখার জন্যই তো এতকিছু করতে হচ্ছে তাকে। মধ্যবিত্ত-নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার, সন্তানদের লেখাপড়ার এত ব্যয় যোগান দিয়ে উঠতেই প্রাণান্তকর অবস্থা। তারপর সে অর্থ কোন কারণে জলে যাক ওদের লেখাপড়া ব্যাহত হোক তা কেউ মেনে নিতে পারেন না। তাই পড়া ছাড়া সন্তানের সাথে মায়ের আর কথা থাকছে না। শুধু তাই নয় তারা অনেক সময় মায়া-মমতা নির্মমভাবে দূরে ঠেলে দেন। তারপরও বলতে হবে কর্মজীবী মায়েরা যারা আয় উপার্জনের জন্য ঘরের বের হন, অফিস-আদালত করেন তারা একটা নিয়মের মধ্যে রেখে সন্তানদের লেখাপড়া করাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই শ্রেণীর যেসব মা কর্মজীবী নন তারা দেখা-যায় আরো এক দাপ উপরে। তাদের কাছে কোন সময় অসময় নেই। মনে হয় তারা যেন রাতারাতি তাদের সন্তানদের কিছু একটা বানিয়ে ফেলতে চান। 'পাখি পড়ান' বলে একটা কথা শুনতাম এক সময়। সেই পাখি পড়ানোর মতো করে উঠতে বসতে চলতে শিশুদের পড়িয়ে যাচ্ছেন যিনি পারছেন না তিনি যোগান দিতে চেষ্টা করছেন কাড়ি কাড়ি টাকা। আবার কোন শিশুর ওপর এর দুটোই চলছে।

তবে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর শিশুরা এর আওতায় ঠিকমতো এখনও পড়েনি। গ্রামে-গঞ্জে হাটেবাজারে ডিশলাইন গেছে ইন্টারনেট যেয়ে পারেনি। ছোটরা সেখানে কার্টুন ছবি দেখা নিয়ে মাতামাতি করতে পারছে না। বড়রাই দিনরাত সিনেমা দেখতে টিভি দখল করে রাখছে। সেখানেও শিশুরা নোট-গাইড টানছে কোচিং করছে কিন্তু এত কঠিন অবস্থায় তারা এখনও পড়েনি। তারা মায়ের হাতের মাখানো ভাত মায়ের সাথে কথা বলতে বলতেই খাচ্ছে। কবে মামা বাড়ি যাবে সে গল্প শুনছে। খোলা মাঠ-ঘাট আলো বাতাসে দৌড়াচ্ছে।

এবার এই ছোট্ট শিশুদের লেখাপড়ার কথা আরেকটু বলি যারা স্কুলে যাবে। 'তালপাতায় হাতে খড়ি' শিরোনামে একবার এ কলামে কিছু লিখেছিলাম। লিখেছিলাম এক সময় শিশুদের প্রথম স্কুলে যাওয়ার আনন্দ আয়োজন কেমন ছিল তা নিয়ে। এখন দিন পাল্টেছে। শহরের শিশুদের কথা কিছু বলেছি যে তারা এখন কম্পিউটারের সাথে কিভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। হাতে খড়ি নেয়ার কোন আয়োজনের প্রয়োজন হচ্ছে না। জন্মের পর হামাগুড়ি না দিতেই শিশুর হাত গিয়ে ঠেকছে কম্পিউটারের কীবোর্ডে, চোখ গিয়ে ঠেকছে টিভি-কম্পিউটারের পর্দায়। মোবাইলে খেলছে গেম। সে যাহোক, বিশেষ করে রাজধানী শহর ঢাকার কথায় বলি। শিশুর বছর পাঁচেক বয়স না হতেই মা-বাবার ঘুম হারাম হচ্ছে কোথায় ভর্তি করবেন তার সন্তানকে একথা ভেবে। এই যে আজকে নোট-গাইড-কোচিং নির্ভর লেখাপড়া চলছে এটার শুরু কিন্তু এই ভর্তির ঘটনা দিয়ে। ব্যাপারটা রীতিমতো যুদ্ধের সামিল হয়ে উঠেছিল তাই বলা হয় ভর্তিযুদ্ধ। একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করতে হবে তা সে যেভাবেই হোক। দেখা গেল নাম করা ভালো ভালো স্কুলগুলোতে ভর্তির গ্যারান্টি দিয়ে শুরু হয়ে গেল ভর্তি কোচিং। অভিভাবকরাও এ সুযোগ গ্রহণ করতে ছাড়ল না। তারা দেখলেন অর্থের যোগান দিতে পারলেই কাজ হবে, হলোও তাই। আজকের এ অবস্থার শুরুটা তো হয়েছে সেখান থেকেই। সবাই কোচিং করছে এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষক সবার হাতেই নোট-গাইড তীর্থকভাবে শোভা পাচ্ছে।

তবে গ্রামের চিত্র ভিন্ন। হাঁটতে পারে একটু কথা বলতে পারে এমন শিশু নিজের থেকেই বায়না ধরছে সে স্কুলে যাবে। তার বড়রা যাচ্ছে দেখে সেও যাবে। এর কোন আয়োজন-প্রয়োজন লাগছে না। বড়দের পিছে পিছে চলে যাচ্ছে স্কুলে। প্রাথমিক শিক্ষার বড় অগ্রগতি এখানেই – সব শিশু স্কুলমুখী হয়েছে।

সে যাহোক, সকল শিশুর ভর্তির অধিকার রয়েছে প্রথম শ্রেণীতে। কাজেই প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে মেধা যাচাইয়ের প্রয়োজন তো নেই-ই লটারিরও কোন প্রয়োজন নেই। আসবে আর ভর্তি হবে। সিট শেষ হয়ে যায় পাশের স্কুলে গিয়ে ভর্তি হবে সেটা সরকারি-বেসরকারি যা-ই হোক। এর জন্য সকল স্কুলের শুরুটা থাকতে হবে প্রথম শ্রেণী থেকে। জানতে হবে কেবল শিশুর পিতামাতার বসবাস ওই স্কুল এলাকার মধ্যে পড়ে কিনা। এলাকা নির্ধারণ করতে হবে বিদ্যমান এক স্কুল হতে আরেক স্কুলের দূরত্ব দিয়ে যাকে ক্যাসমেন্ট এলাকা বলে। আশার কথা এলাকা নির্ধারণের এ কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে। বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৫ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, শিশুরা যে এলাকায় বসবাস করে সেখানকার স্কুলগুলোতে সুযোগ পাওয়া তাদের অধিকার। সে অনুযায়ী ইতোমধ্যে ৪০ ভাগ এলাকা কোটা চালু হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে বাকিটাও হবে এবং এ কাজে সরকারি বেসরকারি বলে কিছু থাকবে না।

প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে লটারি প্রথা চালু হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীতে সেটা নয় কেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু শিশুদের নিকট থেকে আমরা কী পরিমান লেখাপড়া আশা করি যে একেবারে বাংলা ইংরেজি অংক বিষয়ে পৃথক পৃথক করে নম্বর বসিয়ে পরীক্ষা নিয়ে তবে ভর্তি করতে হবে। যে শিশু দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হবে সে তো প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোথাও পড়েছে– তার একটা কাগজ হাতে নিয়েই তো সে তার কাছের স্কুলটাতে ভর্তি হতে যাবে। সেটাই তো যথেষ্ট। স্কুল যদি প্রথম শ্রেণী থেকেই হয় তাহলে কয়টা সিটইবা বছরে খালি হতে পারে অন্য সব ক্লাসে। বসিয়ে দু-এক কথা জানতে চাইলেই তো সেটা হতে পারে।

এলাকা কোটার কথায় আসি। প্রথমেই ধরে নিতে হবে খারাপ স্কুল বলে কিছু নেই। সব স্কুল ভালো। এতে খারাপ(?) স্কুলও ভালো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কেউ যদি মনে করেন তার বাসার কাছের স্কুলটা ভালো না কাজেই তার সন্তানকে অমুক স্কুলে পড়াতেই হবে তাহলে তাকে ওই এলাকার বাসিন্দা হতে হবে। এতে যদি কোন এলাকার বাসাভাড়া বেড়ে যায়, জমির দাম বেড়ে যায়, ব্যয় বহুল হয়ে ওঠে, সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে, উঠবে। স্কুল বড় করতে হলে, হবে। এবং যদি এ ইস্যুকে সামনে নিয়ে ধনিক শ্রেণীর পৃথক আবাস গড়ে ওঠে, উঠবে। এতে অন্যদের ক্ষতি হবে না বরং তারা স্বস্তিতে থাকবে।

এতে বড় একটা সুবিধা হবে শিশুরা হেঁটে স্কুলে যাতায়াত করতে পারবে। যেটা এখন ঢাকা শহরের শিশুদের জন্য কল্পনা করাও কঠিন। বাসার কাছে স্কুল অথবা স্কুলের কাছে বাসা– ভর্তি সেখানেই হতে হবে তা সে স্কুল সরকারি হোক আর বেসরকারি হোক। আগেই বলেছি কোন স্কুল খারাপ না এ থিওরি সামনে রেখেই একাজ করতে হবে। কথাটা শুনতে যেমনই লাগুক না কেন কাজটা করা গেলে ঢাকা মহানগরীর বর্তমানে যে এক নম্বর সমস্যা যানজট তাও বহুলাংশে সমাধান হয়ে আসবে।

শুরু করেছিলাম ছোট্ট শিশুদের আদর-সোহাগের কথা দিয়ে। শেষও করব ওই কথা বলে, ওরা যেন আদর-সোহাগ থেকে কোন রকম বঞ্চিত না হয়। ওদের কাজ ওরাই করবে, ওদের দিয়েই করাতে হবে – আমরা যেন কেবল দায়িত্ব পালন করে শেষ না করি।